দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 AUG 2017 ..
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৬ .....

শিক্ষক-শিক্ষার্থী রেষারেষির দায় কার?

ইয়াসির আরাফাত বর্ণ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যে চলমান রেষারেষির চাক্ষুষ সাক্ষী হতে হচ্ছে বর্তমান সময়ে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আন্তঃসম্পর্কের অবনতি হচ্ছেই দিনকে দিন। সম্প্রতি ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, বরিশাল, রাজশাহী ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ঘটনাবলি ও আন্দোলন সে সংকটকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের রূপ যেমন হওয়া উচিত তার ঠিক বিপরীত যে অবস্থান দাঁড়িয়ে গেছে তা পড়ালেখার জন্য নয়ই বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থিতি রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড নেতিবাচক। আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচনে শিক্ষার্থী প্রতিনিধির আবশ্যিকতা চেয়ে আন্দোলন করা, শিক্ষার্থীদের ওপর সে বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হামলা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি মার খাওয়ার পর জবাব চাইতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকদের অসহনশীল কার্যকলাপ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারদফা জনদাবি এর বিরুদ্ধে প্রশাসন ও শিক্ষকদের একরোখা আচরণ আর সর্বশেষ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা কর্মী দিয়ে শিক্ষার্থীদের মার খাওয়ানো —এ সব ঘটনাতেই স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জড়িত থাকার বিষয়টি খুব স্পষ্ট এবং এসব ঘটনা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষক নাম ধারণের প্রতি যে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে তা শিক্ষার্থী-শিক্ষক বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণায় যে সর্বব্যাপী অগ্রগতি হবার কথা তার পথে 'বার্লিন প্রাচীর' হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শিক্ষকরা আক্ষরিকভাবে একেকজন জ্ঞানের মহীরুহ হবার কারণে শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার দাবিদার। কিন্তু বর্তমান শিক্ষকদের আচরণ যতটা না শিক্ষকসুলভ তার থেকে বেশি আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে শিক্ষক নামধারী হয়েও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অবহেলা ও যথাযথ সম্মান না পাবার দরুন শিক্ষকরা যেমন দিনে দিনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন শিক্ষার্থীদের ওপর তেমনি শিক্ষক হয়েও আমলার মতো আচরণের কারণে শিক্ষার্থীরাও অবহেলা ও ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকছেন শিক্ষকদের উপর। এ দুটির কোনোটিই অবশ্যই সুস্থ চর্চা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় এক শিক্ষক একই সঙ্গে নিরাপত্তা পর্ষদে কাজ করছেন, হল প্রশাসনের কর্তা হয়ে বসে আছেন, বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব পালন করছেন, আবার ক্লাসও নিচ্ছেন। ফলে কোনোটাই করতে পারছেন না ভালোভাবে বরং হয়ে উঠেছেন 'যতখানি না শিক্ষক, তারচেয়ে বেশি আমলা'। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এসব অতিরিক্ত দায়িত্ব শিক্ষকদেরই নেয়ার কথা, কিন্তু একজনের উপর একাধিক দায়িত্ব দেয়া অথবা একজন যেচে পড়ে একাধিক দায়িত্ব নেয়াতে প্রতিষ্ঠানগুলো তো গতিশীল হচ্ছেই না বরং প্রশাসনিক জটিলতা পাকিয়ে যাচ্ছে বহু জায়গায়। এতো কিছুর পরেও শিক্ষার্থীরা সব সয়ে নেন যদি কিনা তারা একটু স্বস্তিতে, শান্তিতে শিক্ষা গ্রহণ চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তা না হয়ে হলে সিট না পেয়ে বিশৃঙ্খলা, খাবার নিয়ে বিড়ম্বনা, সেশনজট, লাইব্রেরিতে বই সংকট, পাঠ্যক্রম নিয়ে শিক্ষকদের বৈরী আচরণ যখন মোকাবিলা করতে হয় শিক্ষার্থীদের তখন এ চিন্তা তাদের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবেই আসে যে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেয়া শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের স্বার্থে তো কাজ করছেনই না বরং শিক্ষা-গবেষণায় ঘাটতি তৈরি করে নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন। আর এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের মন থেকে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উধাও হয়ে যাওয়াটা খুব বেশি অলীক নয়।

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও আসলে শিক্ষকেরা কতটুকু ভাবছেন তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা করা যায় এবং সে আলোচনার শুরুতেই ১৯৬৯ সালে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে নিহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ ড. শামসুজ্জোহার নাম চলে আসে, যিনি কী না শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের বুকে বিদ্ধ করেছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ছোঁড়া বুলেট। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের বিবিধ সব ন্যায্য আন্দোলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ চড়াও হয়েছে, হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা, নানান সময়ে শিক্ষার্থীদের নামে দেয়া হয়েছে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। কিন্তু এসব ঘটনায় দু-একজন হাতে গোনা শিক্ষক ছাড়া বেশিরভাগ শিক্ষকই চুপ থেকেছেন, হাওয়া কোন্‌দিকে যায় তা বোঝার চেষ্টা বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে এসে দাঁড়াননি। শিক্ষার্থী নিরাপত্তা যেখানে বার বার ব্যাহত হয়েছে, সেখানে শিক্ষকদের এমন নিষ্ক্রিয় আচরণ শিক্ষার্থীদের মনে যে বিরূপ ধারণা ফেলেছে তাতে যেমন শিক্ষার্থী হারিয়েছেন তাদের প্রতি ভরসার জায়গা তেমনি বাড়তেই থেকেছে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব। এমন কী রাজনৈতিক ইস্যুর বাইরেও যখন বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা বার বার নিগৃহীত হয়েছে, নারী শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে তখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা সে বিষয়টি নিরসনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিরাপত্তা পর্ষদের ওপর দিয়েই হাঁফ ছেড়েছেন। এমন শিক্ষার্থী বিচ্ছিন্ন আচরণের কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চোখে তারা হয়ে পড়েছেন সামাজিক উচ্চবিত্ত শ্রেণি আর শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে কল্পনা করতে আরম্ভ করছে নিম্নবিত্তের কাতারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বাড়তে থাকা এমন প্রবল নাগরিক বিচ্ছিন্নতা কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎকৃষ্টতর জ্ঞানকেন্দ্র তো হতে দিচ্ছেই না বরং এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষমূলক মনোভাব আরো চাঙ্গা করে তুলেছে। যার প্রমাণ আমার দেখেছি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকদের তেড়ে আসা অথবা শিক্ষকদের দিকে শিক্ষার্থীদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের মাধ্যমেই। এছাড়াও প্রকৃত মেধাবীদের বাদ দিয়ে দলীয়ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের মত প্রদানের সুযোগ না দেয়া, পাঠ্য ব্যবস্থা নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের মত না নেয়া বা নিলেও সে মতের গুরুত্ব না দেয়া, শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার সুষ্ঠু তদারকি না করার ফলে শিক্ষার্থীদের মনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ যেদিন বিপদসীমা অতিক্রম করবে সেদিন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রগুলোতে যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে তখন দেখা যাবে তার দায় কেউই নিচ্ছে না। না শিক্ষকেরা না শিক্ষার্থীরা, কিন্তু তার মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষায় সীমাহীন ভোগান্তিতে পড়তে হবে রাষ্ট্রকে, সমাজকে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়